প্রথম বাঙালি নারীবাদী

বেগম রোকেয়া

গোলাম মুরশিদ

সাফল্য এবং খ্যাতি সব সময়ে কর্মনির্ভর নয়। ক্বচিৎ সিদ্ধি লাভ হয় নানা কার্যকারণে, খ্যাতি লাভের সম্ভাবনা ক্ষীণতর। বস্তুত, কাল,এবং প্রতিবেশ, এমন কি, ভাগ্য আনুকূল্য ছাড়া ব্যাপক স্বীকৃতি অপ্রত্যাশিত। সমকালের তুলনায় যাঁর চিন্তা ছিলো অত্যন্ত প্রাগ্রসর, কর্মবিমুখ সমাজে অষ্টপ্রহর যিনি সুকঠোর কর্তব্যরত, বাক্য এবং কর্মে যিনি অভেদ, এমন একজন অসামান্য নারী – বেগম রোকেয়ার প্রসঙ্গে এ কথা মনে হলো। রোকেয়া যে যথার্থই অসাধারণ নারী ছিলেন এবং বঙ্গ দেশের নারীমুক্তি আন্দোলনে এই শতাব্দীর সূচনায় তিনি যে বিশেষ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন, এ কথা অনস্বীকার্য। ১৯০৪ সালে, মাত্র ২৪ বছর বয়সে রেকেয়া লিখেছিলেন, পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষরা কেবল গায়ের জোরে মেয়েদের বঞ্চিত করেছেন সকল ন্যায্য অধিকার থেকে। প্রবল সব বাধা অগ্রাহ্য করে যখনই

> কোনো ভগ্নী মস্তক উত্তোলন করিয়াছেন, অমনি ধর্মের দোহাই বা শাস্ত্রের বচন–রূপ অস্ত্রাঘাতে তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়াছে। .. আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্যে পুরুষগণ এই ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ... এই ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধিব্যবস্থা ভিন্ন কিছুই নহে। মুনিদের বিধানে যে কথা শুনিতে পান, কোনো স্ত্রী-মুনির বিধানে হয়ত তাহার বিপরীত নিয়ম দেখিতে পাইতেন। ...ধর্ম আমাদের দাসত্বের বন্ধন দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর করিয়াছে; ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।

সত্য কথা এমন সরল অথচ বলিষ্ঠ কণ্ঠে সেকালের আর কোনো বাঙালি মহিলা বলেছিলেন বলে আমার জানা নেই।

ভাবতে অবাক লাগে কোনো আধুনিক সেক্যুলার পরিবারে রোকেয়া লালিত নন। রংপুরের একটি গ্রামের ঐতিহ্যিক মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা আলি সাবের পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকিত ছিলেন না; এমন কি, তিনি ইংরেজি ভালো জানতেন, এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণও নেই। উর্দু–ফারসি জানতেন সামান্য। স্ত্রী এবং সন্তান থাকা সত্ত্বেও সিপাহি বিপ্লবের সময়ে একটি ইংরেজ মহিলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। হতে পারে, বিপদগ্রস্ত ছিলেন বলেই সে মহিলা তাঁর শরণার্থী হয়েছিলেন। কিন্তু অতঃপর কিছু কালের জন্যে শ্বেতাঙ্গিনীর মনোরঞ্জনেই আলি সাবের প্রাণপাত করেন। সে বিয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; তবে, মনে হয়, ইংরেজ মহিলা আলি সাবেরের মনে ইংরেজপ্রীতির স্থায়ী ছাপ রেখে যান। হয়তো তারই ফলস্বরূপ, আলি সাবের তাঁর দুই পুত্রকেই কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সে ভর্তি করান। এবং লেখাপড়ায় সুবিধে হবে বলে গোটা অথবা আংশিক পরিবার কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। তাঁর এই দুই ছেলের মধ্যে একজন ইবরাহিম সাবের সম্ভবত ১৮৮৫ সালে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে বিএ পাশ করেন। বোধ হয় বলার কারণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাগজে এর নাম আছে মুহাম্মদ ইবরাহিম। নামের শেষে সাবের নেই। সেকালে ইবরাহিম নামে অনেকে সেন্ট জেভিয়ার্সে লেখাপড়া করতেন না। তা ছাড়া, এই বিশেষ ইবরাহিমের বয়সও রোকেয়ার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মতোই মনে হয়। এ থেকে আমার ধারণা ইনিই ছিলেন ইবরাহিম সাবের।

তিন কন্যা ছিলো আলি সাবেরের। সেকালে মেয়েদের লেখাপড়ার রীতি না থাকায়, এবং মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব আরও বেশি প্রবল থাকায়, মেয়েদের তেমন লেখাপড়া শেখানোর কথা তিনি ভাবেননি। জ্যেষ্ঠ কন্যা করিমুন্নেসাকে (১৮৫৫-১৯২৬) কোরান পড়তে শেখান, সেই সঙ্গে খানিকটা উর্দু এবং ফার্সিও। কিন্তু বাংলা নয়। মেধাবী করিমুন্নেসা অবশ্য বাংলা শেখেন ভাইদের বাংলা পড়তে দেখে, স্বচেষ্টায়। তাঁর দৃষ্টান্ত আরও অর্ধ শতাব্দী আগেকার হিন্দু সমাজের – রাসসুন্দরী দেবীদের দৃষ্টান্তকেই মনে করিয়ে দেয়। একদিন বাংলা পুঁথি পড়ার সময়ে পিতার কাছে ধরা পড়ে করিমুন্নেসা বিব্রত হন। সমাজের চাপে অল্প কালের মধ্যে মত বদল করলেও, অপ্রত্যাশিত ঔদার্যের পরিচয় দিয়ে পিতা তাঁকে বাংলা শিখতে তাৎকালিকভাবে উৎসাহই দেন। করিমুন্নেসার বাংলাপ্রীতি আর তাঁর দু ভাই–এর পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত উদার হৃদয় রোকেয়া মানসিক বিকাশে সহায়ক হয়েছিলো নিঃসন্দেহে।

রোকয়ো জন্ম ১৮৮০ সালে। করিমুন্নেসার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল হালিম গজনভির এক বছরের ছোটো তিনি। ততো দিনে কলকাতায় ঠাকুর পরিবারের গৃহবধূরা কেবল পর্দা ভাঙ্গেননি, রীতিমতো ঐতিহ্যিক মূল্যবোধে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বিলেত ঘুরে আসা, ঘোড়ায় চড়ে রাস্তা দিয়ে হাওয়া খেতে যাওয়া, মঞ্চে অভিনয় করা – ইত্যাদি অনেক কিছুই তাঁরা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিকতার ঢেউ সমাজের সর্বত্র সমান অথবা একই সময়ে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। বিশেষ করে আলি সাবেরের মতো অভিজাত মুসলমান পরিবারগুলো মহিলাদের শিক্ষিত করার অথবা তাঁদের

বন্দীত্ব ঘোচানোর প্রশ্নে ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল। তবে আগেই লক্ষ্য করেছি, এ ব্যাপারে দৈবক্রমে রোকেয়ার পরিবার ছিলো বলতে গেলে একেবারে ব্যতিক্রমধর্মী। সেই আনুকূল্যের মধ্যেই রোকেয়া লালিত হন।

রোকেয়ার শৈশবেই করিমুন্নেসা বিধবা হন। অতঃপর দু পুত্রের সঙ্গে রোকেয়াকেও তিনি মানুষ করেন। উর্দু, ফারসি আর আরবি ছাড়াও, রোকেয়া যে বাংলা এবং ইংরেজি শিখতে আরম্ভ করেন, তার প্রধান কৃতিত্ব করিমুন্নেসা আর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইবরাহিম সাবেরের। উর্দু ছিলো রোকেয়ার বলতে গেলে মাতৃভাষা। উর্দুতে তিনি তাঁর রচনাও প্রকাশ করেছিলেন। ফারসিও তিনি খুব ভালো শিখেছিলেন। বিশিষ্ট স্বকীয় ভঙ্গি না থাকলেও, তাঁর প্রকাশিত রচনাসমূহ প্রমাণ করে যে, তাঁর বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষার বুনিয়াদই খুব মজবুত ছিলো। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তাঁর ওলর্ফটভট্', ঊরণটব বাংলা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত নয়, বরং উল্টো ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত। তাঁর আগে আরও দু-তিনজন বাঙালি মহিলার ইংরেজি রচনা প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু বাংলায় তাঁরা লেখেননি। আপন চিন্তাকে রোকেয়া মূর্ত করেন ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই। অরু, তরু – দুই বোন এবং সরোজিনীর সঙ্গে রেকেয়ার পারিবারিক পার্থক্য ছিলো একেবারে দুস্তর, সেটাও এখানে মনে রাখা দরকার। য়োরোপে যাওয়া এবং পিতামাতার অমন আনুকূল্য লাভ করা দূরে থাকুক, স্বদেশের কোনো বিদ্যালয়েও রোকেয়া লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি। পাবেন কী করে! ব্রাহ্ম অথবা পাশ্চাত্য প্রভাবিত হিন্দু পরিবারে দুচারটা ব্যতিক্রম দেখা দিলেও, মুসলমান পরিবারের একটি মেয়ের পক্ষে তখন পর্দা ভেঙ্গে বিদ্যালয়ে যাবার প্রশ্নই ছিলো অবান্তর। এই পর্দা প্রথা কতো কঠোর ছিলো, রোকেয়ার নিজের জবানি থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। বাড়িতে কোনো স্বল্প পরিচিত মহিলা বেড়াতে এলেও, পাঁচ বছরের রোকেয়াকে পর্দা করতে হতো। কোনো একবার বাইরের মহিলারা বেড়াতে এলে কদিন কী প্রাণপণ প্রযত্নে প্রায় অনাহারে কখনো চিলেকোঠায়, কখনো সিঁড়ির নিচে, কখনো দরজার আড়ালে লুকিয়ে থেকেছেন তিনি। প্রায় সমবয়সী ছ বছরের হালিম কখনো যদি তাঁকে একটু দুধ এনে দিতেন, তা হলে সেটাই হতো তাঁর একমাত্র পথ্য। মুসলমান মেয়েদের লেখাপড়ায় আর-একটা মস্তো বড়ো বাধা ছিলো এই যে, তখনো তাঁদের লেখাপড়ার কোনো স্কুল ছিলো না। সে সম্পর্কে পরে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

অবরোধের দারুণ যন্ত্রণা ব্যক্তিগত জীবনেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সে তো করিমুন্নেসা এবং সেকালের লক্ষ লক্ষ মহিলারও করেছিলেন। কিন্তু অবরোধ মোচন করতে হবে, তার চেয়েও বড়ো কথা নারীসমাজকে মুক্ত করতে হবে বহু শতাব্দীর দৃঢ়মূল বন্ধন থেকে – এ চেতনা তিনি কোথায় পান, তা বলা শক্ত। যে অকিঞ্চিৎকর তথ্য আমার হাতে আছে, তা থেকে নিশ্চিত হদিস দেওয়া অসম্ভব। অনুমান হয়তো সম্ভব। রোকেয়া সম্পর্কে কয়েকখানা বই এবং তাঁর কিছু চিঠিপত্র প্রকাশিত হলেও, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রধান অংশই এখনো অজ্ঞাত। বর্তমান রচনা মূলত রোকেয়ার রচনাবলীর ওপর নির্ভরশীল। এবং এর লক্ষ্য প্রধানত তাঁর চিন্তার বিবর্তন দর্শানো।

তাঁর বিয়ে হয় সে যুগের তুলনায় বেশ পরিণত বয়সে – ষোলো বছরে। (একটা অসমর্থিত সূত্র অনুযায়ী আঠারো বছরে।) কিন্তু তাঁর পাত্রটি বিলেতফেরত এক অবাঙালি দোজবরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভাগ্যের কী পরিহাস! পরবর্তী কালে যিনি হন নারীমুক্তি আন্দোলনের এতো বড়ো অগ্রদূত, তাঁর বিয়ে হয় তাঁর চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি বয়সী এক দোজবরের সঙ্গে। আগের পক্ষের এক কন্যা ছিলেন সাখাওয়াতের। পরে সে কন্যা এবং তাঁর স্বামী রোকেয়াকে কম লাঞ্ছনা দেননি। তবে আপাতদৃষ্টিতে যতোটা দুর্ভাগ্যজনক মনে হচ্ছে, বাস্তবে বিয়েটা রোকেয়ার জন্যে তেমন শোচনীয় ছিলো না। বরং আমার ধারণা, বিয়েই হঠাৎ রোকেয়াকে মুক্তি দেয় পৈতৃক পরিবারের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে, যেখানে তাঁর সত্যিকার অর্থে কোনো স্বাধীনতা ছিলো না। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন, কিন্তু মনে হয়, সাখাওয়াতের সাহচর্যই তাঁকে অসাধারণ ঔদার্য দান করে।

প্রথম দিকের সরকারী কাগজপত্রে সৈয়দ সাখাওয়াদ হোসেনের জন্ম ১৮৫৫ সালের শেষ দিকে অথবা ১৮৫৬ সালেল প্রথম দিকে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরে এটাকে শুধরে অগস্ট ১৮৫৬ বলে লেখা হয়েছে। ১৮৭৫ সালে পাটনা কলেজ থেকে তিনি এফএ পাশ করেন, দ্বিতীয় বিভাগে। তারপর হুগলি কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে বিএ পাশ করেন ১৮৭৮ সালে। ১৮৮৪ সালের মার্চ মাসে তিনি সপ্তম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে মালদায় কাজ আরম্ভ করেন। মাঝখানের ক বছর তিনি কী করেন, আমার জানা নেই। তিনি কৃষি বিদ্যা শেখার জন্যে সরকারী বৃত্তি নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন। ঐ একই বৃত্তি নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও বিলেতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সাখাওয়াত কখন যান, তা আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। ১৮৮৫ সালের পর প্রায় তিন বছরের জন্যে তাঁর চাকরি ডিরেক্টর অব অ্যাগ্রিকালচারের অধীনে বদলি করা হয়েছিলো (এবং তিন বছরের মধ্যে শেষ বছর তিনি কটকের কনিকা ওয়ার্ড এস্টেটে কাজ করেন।) ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিশেবে কাজ শুরু করার ঠিক আগে, নয়তো এই সময়েই তিনি য়োরোপে গিয়েছিলেন। তাঁর বিলেতে অধ্যয়নের ফলে তিনি এম.আর.এ.সি. হয়েছিলেন – বোধ হয় মেম্বার রয়্যাল কলেজ অব অ্যাগ্রিকালচার। মালদা ছাড়া, বীরভূম এবং বর্ধমানেও তিনি তিনি অল্পকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তবে চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তিনি তাঁর জন্মস্থান বাগলপুরে কাটিয়েছিলেন। চাকরিতে উন্নতি করে তিনি তৃতীয় শ্রেণীর ডেপুটি পর্যন্ত হয়েছিলেন।

স্ত্রীকে হয়তো তিনি এই নবলব্ধ আদর্শে সংস্কৃত করতে ব্যর্থ হন। অপর পক্ষে, রোকেয়াকে তিনি পেয়েছিলেন উৎসুক এবং আগ্রহী শিষ্যা হিশেবে। মতিচুর-এর (দ্বিতীয় খণ্ড) উৎসর্গে করিমুন্নেসাকে উদ্দেশ্য করে রোকেয়া বলেন, তিনিই তাঁকে বর্ণপরিচয় পড়তে শিখিয়েছিলেন। ভাগলপুরে উর্দুভাষী পরিবারের স্ত্রী হিশেবে চোদ্দো বছর এবং কলকাতায় উর্দু স্কুলের পরিচালিকা হিশেবে নিরন্তর উর্দু বলেও তিনি যে বাংলা ভাষার চর্চা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন, সে কেবল করিমুন্নেসারই আশীর্বাদে। পদ্মরাগ উপনাসটি তিনি উৎসর্গ করেন ইবরাহিম সাবেরকে। এতে তিনি বলেন: পিতা, গুরু ইত্যাদি কেমন তিনি জানেননি, জেনেছেন কেবল ভ্রাতাকে। এবং সেই ভাইই তাঁকে আপন হাতে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু এই দুই উক্তি সত্ত্বেও মনে হয়, তাঁর উচ্চশিক্ষিত এবং স্নেহশীল স্বামীই অনুক্ষণ তাঁকে লেখাপড়া করতে উৎসাহ দেন। সাখাওয়াত উর্দুভাষী ছিলেন, আনুষ্ঠানিক বাংলা হয়তো সামান্যই জানতেন। তবে তিনি হুগলিতে লেখাপড়া করেছেন এবং ক বছর বঙ্গদেশে চাকরি করেছেন। সেই সুবাদে তিনি মৌখিক বাংলা হয়তো জানতেন। কিন্তু তাঁর বাড়িতে বাংলা বলা হতো না। স্বামীর বাড়িতে রোকেয়া যে কখনো বাংলা বলার সুযোগ পাননি, নিজেই তা বলেছেন মতিচুরে। কিন্তু সাখাওয়াত তবু তাঁকে বাংলা লিখতে এবং তা পত্রিকায় প্রকাশ করতে উৎসাহিত করেন, এ অনুমান সমীচীন। অন্তত Sultana's Dream পড়ে সাখাওয়াত যে উৎসাহিত হন, রোকেয়ায় তা উল্লিখিত আছে।

রোকেয়া নিজে যেসব পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থাদির উল্লেখ করেছেন, তা ছাড়া তিনি আর কী পড়তেন, পড়েছিলেন, আমার জানা নেই। সমকালীন পত্রপত্রিকা এবং গ্রন্থাদি তিনি যে নিয়মিত পড়তেন, তাঁর বিভিন্ন রচনায় তার উল্লেখ আছে। প্রধান প্রধান ইংরেজ কবি সাহিত্যিকের নাম ছাড়াও, John Howard Payne, Ellen Hooper প্রমুখ অপ্রধান কবি-সাহিত্যিকের উল্লেখ এবং উদ্ধৃতি আছে তাঁর রচনায়। সেকালের খাতনামা বাঙালি কবি-সাহিত্যিকেরও উল্লেখ করেছেন তিনি। এমন কি, কামিনী সেন, মানকুমারী বসুও বাদ যাননি। কিন্তু যা বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো: সমকালীন ইংরেজি আর উর্দু পত্রপত্রিকার নাম।

স্থায়ী খ্যাতি লাভে ব্যর্থ হলেও, মেরি করেলি (১৮৫৫-১৯২৪) ছিলেন সেকালের বেস্ট সেলার। মানুষের কোমল বৃত্তিগুলোকে নাড়া দিয়ে কী করে জনপ্রিয় লেখিকা হওয়া যায়, কোন ইস্যুগুলো সমসাময়িক সমাজকে স্পর্শ করবে, এসব তিনি খুব ভালো জানতেন। ধর্মীয় আবেগকে, যেমন, তিনি খুব ভালো ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু নারীর স্বাধীনতা, নারীর আপন পরিচয় ইত্যাদি কোনো কোনো থীম ছিলো তাঁর একেবারে নিজস্ব বিষয়। বস্তুত, চিরকুমারী মেরি নারীমুক্তি সম্পর্কে কেবল যে অবহিত ছিলেন, তাই নয়, তাঁর অনেকগুলো উপন্যাসেই এই ভাবনাকে, পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে নারীর বিদ্রোহকে তিনি ভাষা দিয়েছিলেন। তার অত্যন্ত জনপ্রিয় উপন্যাস The Murder of Delicia (১৮৯৬) ছিলো তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ রকম একটা কাহিনী ইংরেজি না–জানা বাঙালি মহিলারা জানবেন না, এটা রোকেয়া চাননি। সে জন্যে এ উপন্যাসের কাহিনীটাকে সংক্ষেপে তিনি পরিবেশন করেছিলেন বাংলা ভাষায়। সেই সঙ্গে তিনি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ডেলিসিয়ার সঙ্গে দাসত্ব মনোভাবাপন্ন বাঙালি নারীর তুলনা করেন। মেরি করেলির সঙ্গে, আরও সরাসরি ভাবে বললে, ডেলিসিয়ার সঙ্গে, রোকেয়ার বক্তব্যের অনেক সাদৃশ্য আছে। রোকেয়া নিজেও তা স্বীকার করেছেন। তবে সেই সঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, এ সাদৃশ্য যখন প্রকাশ পায় তখনো পর্যন্ত তিনি The Murder of Delicia পড়েননি। বই না পড়লেও, পাশ্চাত্য সাহিত্য এবং ভাবধারা থেকেই নারীমুক্তির আদর্শ তিনি স্বীকরণ করেছিলেন, এমন অনুমান বোধহয় অসঙ্গত নয়।

অসাধারণ আর–এক প্রভাব রোকেয়ার ওপর – সেটি বিজ্ঞানের। সেকালের কোনো বাঙালি নারীর রচনায় পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন সম্পর্কিত তথ্য তথা সাধারণভাবে বিজ্ঞান বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের এমন সরল প্রকাশ এবং তার প্রতি কৌতূহল – এক কথায়, বিজ্ঞান মনস্কতা লক্ষ্য করিনি। হয়তো বিলেতে কৃষিবিদ্যায় প্রশিক্ষিত স্বামীর সাহচর্যেই বিজ্ঞানে রোকেয়ার হাতে খড়ি হয়েছিলো। কিন্তু হাতে খড়িতেই তা সমাপ্ত হয়নি। বিজ্ঞান বিষয়ক গভীর আগ্রহ এবং সাধারণ জ্ঞান তাঁর চিন্তাকে সমুজ্জ্বল করেছিলো। বিজ্ঞানের সুস্পষ্ট ছাপ মুদ্রিত বিশেষ করে তাঁর সুলতানার স্বপ্নে।

পথে নারী বিবর্জিতা – এ বহু কালের পুরোনো লোকোক্তি। বাঙালিদের মধ্যে অবশ্য কেবল নারী নয়, পুরুষেরাও ভ্রমণে অপটু এবং কৌতূহলবর্জিত। সৌভাগ্যক্রমে রোকেয়া উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত ব্যাপকভাবে ঘুরেছিলেন। হয়তো এ–ও তাঁর দৃষ্টিকে প্রশস্ত করে থাকবে। মোট কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ না করলেও, রোকেয়া স্বগঠিত এবং স্বশিক্ষিত মানুষ। এর পেছনে ছিলো ব্যাপক অধ্যয়ন, সযত্ন পরিশীলন, আর পরিবেশের যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য।

"আমাদের সব কার্যের সমাপ্তি বক্তৃতায়, সিদ্ধি করতালী লাভে।" – বাঙালিদের সম্পর্কে রোকেয়ার এই তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে সত্যের অভাব নেই। অন্তত নারীমুক্তি সম্পর্কে যে–মহিলারা সেকালে ধীরে ধীরে সচেতনতা লাভ করছিলেন, এমন কি, কমবেশি সচেতনতার ছাপ রাখছিলেন তাঁদের রচনায়, তাঁদের সম্পর্কে এ কথা আদৌ অপ্রযোজ্য নয়। তাঁরা কেউ রোকেয়ার মতো একই সঙ্গে তাঁদের রচনায় এবং বাস্তব জীবনে নারীজাগরণের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়োজিত করেননি, বোধ হয় কৃষ্ণভাবিনী দাস অথবা সরলা ঘোষালও নন।

উন্নতি এবং মুক্তির প্রথম শর্ত শিক্ষা, নিজেকে এবং জগৎকে জানা – এ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সে জন্যেই পণ করেছিলেন যে, অশিক্ষিত নারীদের মধ্যে জ্ঞানের আলোক যতোটুকু পারেন ছড়িয়ে দেবেন আপন সীমিত শক্তি নিয়ে। সম্ভবত স্বামীর জীবদ্দশাতেই তিনি এ সংকল্প করেছিলেন। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন এবং পরিচালনার জন্যে স্বামী তাঁকে দশ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে, ১৯০৯ সালের মে মাসে রোকেয়া বিধবা হন। শেষ দিকে সাখাওয়াত দীর্ঘ দিন রোগ ভোগ করেন। ১৯০৮ সালের জানুআরি মাসে তিনি দেড় বছরের জন্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত ছুটি নিয়েছিলেন। কিন্তু ছুটি শেষ হবার অল্প আগেই তিনি একেবারে স্থায়ী ছুটি নেন। বয়সের বিরাট ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও রোকেয়া তাঁর স্বামীকে যে আন্তরিকভাবে ভালোবেসেছিলেন, তার আভাস পাওয়া যায়। রোকয়ার পদ্মরাগ উপন্যাসের নায়িকার উক্তি এ রূপ:

> বিধবার স্বামী–স্মৃতিরূপ বহুমূল্য সম্পদ থাকে। পতিধ্যান তাহার নিত্যসহচর। ভীষণ কন্টকাকীর্ণ সংসারে পতিস্মৃতি তাহার একমাত্র সহায়। ...দেবর, ভাশুর এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ছলে কৌশলে সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে পারে, কিন্তু এই "সতীর দেবতা পতি, জীবনের সার/ তেঁই যাচি পূজিবারে চরণ তোমার" – ভাবটুকু অপহরণ করিতে পারে না! ইহাই বিধবার জীবনসর্বস্ব।

আত্মীয়রা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া তাঁর সম্পত্তি কেড়ে নিলেও, রোকেয়া জীবনে অতঃপর কিন্তু স্বামীস্মৃতিই সর্বস্ব হয়নি; সেই স্মৃতিকে সম্বল করে তিনি সংসারের ছোট্টো একটি কোণে হাতে–কলমে নারীমুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করেন।

স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে মাত্র পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে রোকেয়া ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। কিন্তু সাখাওয়াতের পূর্বপক্ষীয় কন্যা এবং সেই কন্যার স্বামীর পীড়নে অল্পকালের মধ্যে তিনি ভাগলপুর ছাড়তে বাধ্য হন। ফলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম প্রয়াস অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। তবে বাধা পেলেও নিরুৎসাহ হননি তিনি। কলকাতায় গিয়ে এক বছর পাঁচ মাস পরে, ১৯১১ সালের ১৬ই মার্চ তিনি আর–একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলেন। এবারে ছাত্রী সংখ্যা আট। আর স্বামীর স্মৃতি জাগরূক রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের নাম দেন "সাখাওয়াত মেমোরিয়াল"। বিদ্যালয়টি ১৯১৫ সালে উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়, আর নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয় ১৯১৭ সালে। তখন ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় ১০৭–এ। উচ্চ শ্রেণীতে কন্যাদের পাঠাতে তখনো মুসলমানদের ঘোর আপত্তি। ছাত্রীর অভাবে তাই ১৯৩০ সালের আগে পর্যন্ত বিদ্যালয়টি রীতিমতো মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি।

এ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সামাজিক পটভূমি কী এবং পরিচালক এবং পৃষ্ঠপোষক কারা, আমার তা জানা নেই – একটি দুটি ক্ষেত্র ছাড়া। গোড়াতে উদারপন্থী রাজনীতিক এবং ব্যারিস্টার আবদুল রসুল এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যাঁরা কন্যাদের এ স্কুলে পাঠাতেন তাঁর মধ্যে একজনের পরিচয় জানি – পাবনার এক পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন তিনি, মোহাম্মদ ইয়াসীন। এ প্রবন্ধের শেষে এঁকে লেখা বেগম রোকেয়ার কয়েকটি চিঠি থেকে বোঝা যাবে স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে রোকেয়া কেমন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের সাহায্য নিয়ে তিনি কিভাবে বেঁচে থাকতে চেষ্টা করতেন। মনে হয় কলকাতার এবং দু–একটি ক্ষেত্রে মফস্বলের শিক্ষিত, অভিজাত এবং তুলনামূলকভাবে কম রক্ষণশীল মুসলমানরাই এই বিদ্যালয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এঁদের অনেকেরই মাতৃভাষা ছিলো উদু। এমন কি – পাবনার পুলিশ কর্মকর্তার যেমন – মাতৃভাষা বাংলা হলেও, সেকালের আভিজাত্যের শর্তস্বরূপ দাবি করতেন তাঁদেরও মাতৃভাষা উর্দু। বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠিকা এবং সেবিকা হওয়া সত্ত্বেও রোকেয়া তাই তাঁর বিদ্যালয়ে কোনো দিন বাংলা পড়াতে পারেননি। ১৯২১ সালে প্রকাশিত মতিচুরের দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গপত্র থেকে জানা যায়, তখনো তাঁর বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রী, শিক্ষিকা এবং কর্মচারী ছিলেন উর্দু ভাষাভাষী। তাঁর নিজের জবানিতে জানতে পারছি – সকাল থেকে রাত দুপুর পর্যন্ত তাঁকেও তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে হতো উর্দুতে।

১৯২৭ সালে তিনি ঘোষণা করেন, ৪০ জন বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রী পেলেই, বিদ্যালয়ে তিনি একটি বাংলা শাখা খুলবেন। বাংলা ভাষাভাষী মুসলমান বালিকাদের জন্যে তখনো কলকাতায় কোনো বিদ্যালয় ছিলো না। তা সত্ত্বেও বাংলা শাখা খোলার তাঁর বাসনা কখনো সফল হয়নি।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছে তখনো সাধারণভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয়নি। এমন কি কারো ইচ্ছে থাকলেও, সে সুযোগ ছিলো না। বেথুন বিদ্যালয় সরকারী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু হিন্দু আর ব্রাহ্ম ছাড়া আর কারো সেখানে অধ্যয়নের নিয়ম ছিলো না। অবশ্য সেটা সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারে অসাধারণ ছিলো না। হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজ এক সময়ে কেবল উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের জন্যে সংরক্ষিত ছিলো। কলকাতা মাদ্রাসা এবং সংস্কৃত

শাখায়। তা সত্ত্বেও, ১৮৯৫ সালে একজন মুসলমান ছাত্রী বেথুনে ভর্তি হবার আবেদন করেও ভর্তি হতে ব্যর্থ হন। প্রথম যে মুসলমান বালিকাকে বেথুনে ভর্তির সুযোগ দেওয়া হয়, তিনি ছিলেন রোকেয়ার আত্মীয়া। ১৯২৫ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হন। ১৮৯০-এর দশকে কলকাতায় দুটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয় বটে, দীর্ঘজীবী হয়নি কোনোটাই। রোকেয়ার বিদ্যালয়কে, এ জন্যে, আপাতদৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক মনে হলেও, আসলে তাঁর ভূমিকা ছিলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এবং সেভাবে বিবেচনা করলে বেথুন, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, অ্যানেট অ্যাক্রয়েড – সবাই কম বেশি সাম্প্রদায়িক স্কুলই খুলেছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত – একুশ বছর ন মাস, রোকেয়া তাঁর বিদ্যালয় পরিচালনায় আপন সামর্থ্য এবং প্রয়াস প্রায় সবটুকুই ব্যয় করেন।

তিন

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এককালে বিতর্কাতীত মহাপুরুষ বলে স্বীকৃত ছিলেন, যদিও সাম্প্রতিক মার্কসবাদী দৃষ্টিতে এখন তাঁদের কর্মকাণ্ড খর্বিত হয়েছে। মানবিকতা এবং সহানুভূতিতে অতুলনীয়, বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কোনো কোনো মার্কসপন্থীর পুনর্মূল্যায়ন এমন যে, কুলীন ব্রাহ্মণদের অধঃপাত থেকে রক্ষা করাই ছিলো নাকি তাঁর কর্মপ্রয়াসের মূল লক্ষ্য। এ ধরনের সমালোচনায় রোকেয়া সাম্প্রদায়িক নিঃসন্দেহে, কারণ বিশেষ করে মুসলমান নারী সমাজের কথা তিনি বার বার করে বলেছেন। শেষ পর্যন্ত নিজেকে তিনি চিহ্নিতও করেছেন মুসলমান বলে। কোরান পাঠের প্রয়োজনীয়তা, তার চেয়েও বড়ো কথা, সকল শিক্ষাই কোরানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে – বার্ধক্যে উপনীত রোকেয়ায় এমন উক্তিও অনুপস্থিত নয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও রোকেয়াকে ধর্মীয়, সামাজিক অথবা লিঙ্গের কোনো ক্ষুদ্র গণ্ডি দিয়ে চিহ্নিত করা সম্ভবত অসঙ্গত।

১৯০৪ সালের জানুআরি মাসে প্রকাশিত তাঁর প্রথম রচনায় সেকালের মহিলাসুলভ মনোভাব একেবারে অনুপস্থিত। বস্তুত, তাঁর আলোচ্য বিষয় স্ত্রীশিক্ষা, শিশুপালন, গৃহকর্ম এসব নয় – যেমনটা সাধারণত সেকালের লেখিকারা করতেন। ধারালো ভাষায় এবং তীব্র ব্যঙ্গে তিনি আক্রমণ করেন বাঙালি চরিত্রকে। বলেন, বাঙালি নিরীহ, কোমল, দুর্বল এবং কাব্যিক, আরামপ্রিয় এবং কাপুরুষ; কোনো অ্যাডভেঞ্চারেই তাঁদের উৎসাহ নেই।

> কুসুমের সৌকুমার্য, চন্দ্রের চন্দ্রিমা, মধুর মাধুরী, যূথিকার সৌরভ, সুপ্তির নীরবতা, ভূধরের অচলতা, নবনীর কোমলতা, সলিলের তরলতা – এক কথায় বিশ্ব জগতের সমুদয় সৌন্দর্য এবং স্নিগ্ধতা লইয়া বাঙ্গালী গঠিত হইয়াছে।" "যদি ভারতবর্ষকে ইংরাজী ধরনের একটি অট্টালিকা মনে করেন, তবে বঙ্গদেশ তাহার বৈঠকখানা এবং বাঙ্গালী তাহাতে সাজসজ্জা! যদি ভারতবর্ষকে একটা সরোবর মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহাতে পদ্মিনী! যদি ভারতবর্ষকে একটা উপন্যাস মনে করেন, তবে বাঙ্গালী তাহার নায়িকা! ভারতের পুরুষ সমাজে বাঙ্গালী পুরুষিকা!"

এই "তৈলসিক্ত, নবগঠিত" বাঙালি প্রধানত পাস বিক্রয় করেন উন্নতির জন্যে। "আমরা অলস, তরলমতি, শ্রমকাতর, কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী কিনা, তাই ভাবিয়া দেখিয়াছি সশরীরে পরিশ্রম করিয়া মুদ্রালাভ করা অপেক্ষা old fool শ্বশুরের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করা সহজ।" অতঃপর রোকেয়া ফর্দ দিয়েছেন, পরিশ্রমবিমুখ বাঙালি কী করে উন্নতির অভিনব পথ আবিষ্কার করেছেন।

চাকুরি যে বাঙালির শিক্ষার এবং জীবনের প্রধান লক্ষ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্যারডি করে সে সম্পর্কে তিনি পরবর্তী কালে লিখেছিলেন – "চাকুরি মা তোর চরণদুটি নিত্য পূজা করি/এই অফিসে চাকুরি যেন বজায় রেখে মরি।" চাকুরি না থাকলে শিক্ষিত বাঙালি যে জীবনকে অর্থহীন গণ্য করেন, তা বলেন পরবর্তী শ্লোকে – "চাকুরি, চাকুরি, চাকুরি, চাকুরি মাথার মাণিক! চাকুরি বিনে বঙ্গবাসীর জীবন ধারণ ধিক!" কর্ম নয় বাগ্মিতাই যে বাঙালির প্রধান গুণ, এবং জ্ঞানবিজ্ঞান নয়, অন্নসংস্থানের কৌশল আয়ত্ত করাই যে প্রথম লক্ষ্য, তিনি তাও উল্লেখ করেন শাণিত ভঙ্গিতে। নবাব, রাজা ইত্যাদি খেতাব পেয়ে অমরত্ব লাভের প্রয়াস পান উপর তলার বাঙালিরা এবং তারই জন্যে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের তোষামোদে তাঁরা প্রাণপাত করেন, এ–ও তাঁর উপহাসের বিষয়বস্তু। এঁরা ইংরেজদের পদলেহন, সংশোধন করে পুনরায় বলেন, জুতালেহন করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। রোকেয়ার আগে ভিন্নতর ভাষায় এবং মেজাজে এ ধিক্কার কেউ কেউ – যেমন রবীন্দ্রনাথ, দিয়েছেন। কিন্তু যা লক্ষযোগ্য তা হলো, সেই ধিক্কারদাতারা কেউ মহিলা ছিলেন না।

এই লেখা প্রকাশিত হবার ৮৫ বছর আগে রামমোহন রায় দুঃখের সঙ্গে যে মহিলাদের কেবল মাত্র পাচিকা, পরিচারিকা, গৃহরক্ষিকা এবং শয্যাসঙ্গিনী হিশেবে লক্ষ্য করেছিলেন এবং মহিলাদের কোনো মেধা আছে কিনা সে সম্পর্কেই পুরুষ সন্দেহের কথা বলেছেন। তার পর শতাব্দী ঘুরে আসার আগেই সেই মহিলাদের একজন পুরুষ সমাজকে এমন তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে পারলেন, এটা নিশ্চয় বাঙালি মহিলাদের প্রগতির একটা অভ্রান্ত এবং

আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। তবে এ লেখা পড়ে সেকালের পুরুষদের পক্ষে একে যে নিতান্ত বেয়াদব এবং সকল মূল্যবোধে অবিশ্বাসী এক মহিলার রচনা বলে গণ্য করেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ দেখিনে।

বস্তুত, সেকালের মহিলাদের তুলনায় রোকেয়ার সচেতনতা ছিলো সুগভীর এবং সুদূরপ্রসারী। গৃহকর্ম এবং সন্তানলালন মহিলাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলেও, তাঁর ভাবনা কেবল এ সবে সম্পৃক্ত নয়। তাঁর বিবাহিত জীবন সংক্ষিপ্ত এবং তিনি নিঃসন্তান, হতে পারে তা–ই এর প্রধান কারণ। কিন্তু কারণ যাই হোক, দেয়াল–তোলা সংকীর্ণ গৃহে জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটালেও, তাঁর চিন্তা বোরকা অথবা অন্তঃপুরের পর্দা দিয়ে বাধাপ্রাপ্ত নয়; সাম্প্রদায়িকতা অথবা ভদ্রলোকসুলভ গণ্ডির দ্বারাও নয়। তিনি যখন বলেন: ''কেবল কলিকাতাটুকু আমাদের ভারতবর্ষ নহে, মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যশালী ধনাঢ্য ব্যক্তি সমস্ত ভারতের অধিবাসী নহে।'' – তখন তাঁর বক্তব্যে অভিনবত্ব প্রকাশ পায় না বটে, কিন্তু পর্দার অন্তরাল থেকে উচ্চারিত এ কণ্ঠ পাঠককে সচকিত না করে পারে না। সচকিত পাঠককে রোকেয়া আরও স্পষ্ট করে বলেন, চাষাই সমাজের মেরুদণ্ড। এ উক্তিতেও মৌলিকত্ব অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর সমাজ সচেতনতা এবং তেজ উভয়ই এ থেকে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়। চরকা এবং এন্ডিসহ অন্যান্য কটিরশিল্পের পৃষ্ঠপোষণ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের জন্যে আবশ্যিক, ভদ্রলোকদের তাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

রোকেয়ার মধ্যে ছিলো যাকে বলা যায় vision। সমাজের যেসব সমস্যা তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন এবং সম্ভাব্য সমাধানের নির্দেশ দেন, সে সবেও একটা প্রশস্ত দূরদৃষ্টি প্রতিবিম্বিত। এমন কি, হালকা চালে তিনি যখন সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর কথা বলেন, তখনো তাঁর ভবিষ্যৎদর্শন প্রকাশ পায়। তাঁর নারীস্থানের নারীরা যে পুরুষদের অন্তঃপুরে বন্দী করে রেখে দেশ পরিচালনা করার দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করতে পেরেছেন, সে বিজ্ঞানে তাঁদের অধিকতর অধিকারবশত। সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা রান্না থেকে যুদ্ধ জয় – সবই করতে সক্ষম। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে রোকেয়া যখন এ কথা লেখেন, তখন একে অবাস্তব মনে হলেও, শতাব্দীর শেষে এসে সৌরশক্তির অসাধারণ সম্ভাবনার কথা মানুষ জানতে পেরেছে এবং এর মধ্য দিয়ে রোকেয়ার দূরদৃষ্টি কতোটা বাস্তবিক, সেটাই প্রমাণিত হয়েছে। Sultana's Dream-এ যে নারীস্থান এবং নারীর আধিপত্যের কল্পনা, তা অভিনব অথবা মৌলিক নয়। এরিস্টোফেনিসের Lysistrata এর সর্বপ্রথম নিদর্শন, খৃস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে। উপন্যাসে এভাবের প্রতিফলন ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে একেবারে অনুপস্থিত নয়। তা সত্ত্বেও বলা যায়, Sultana's Dream নামে স্বপ্ন, উচ্চতর কোনো দাবি বা ভানও নেই লেখিকার, তবু তাঁর স্বপ্ন একেবারে আজগুবি নয়। বরং তার মধ্যেও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রতিবিম্বিত। ইতিমধ্যে মহিলাদের সামাজিক এবং পরিবারিক ভূমিকায় যে বিবর্তন এসেছে, তা থেকে এই মন্তব্যই সমীচীন।

চার

বিবিধ অবদান সত্ত্বেও রোকেয়া সবচেয়ে বড়ো পরিচিতি নারীমুক্তি আন্দোলনের কর্মী এবং প্রেরণাদাতা হিশেবে। আপন অবস্থা দেখেই তিনি নারীর সার্বিক বন্ধন এবং অসম্মান প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করেছিলেন। দাসব্যবসা নিষিদ্ধ হলেও, তাঁর মতে, প্রত্যেকের ঘরেই এ ব্যবসা পুরোদমে বিরাজ করছে। কারণ নারীদের অবস্থা ক্রীতদাসীদের চেয়ে কোনোক্রমে উন্নত নয়। পার্থক্য এই যে, দাসরা যদি বা মুক্তির স্বপ্ন দেখে, অথবা একদিন কোনোক্রমে কেউ কেউ মুক্তিও লাভ করে, মহিলারা তাও আশা করতে পারেন না। তাঁদের মন পর্যন্ত চিরদাসীতে পরিণত হয়েছে। সমাজের প্রচলিত ভাষা এবং মূল্যবোধে এই দাসত্ব স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠিত। এ জন্যেই নারীর বিবাহিত জীবনসঙ্গীকে বলা হয় স্বামী বা প্রভু। এবং নারী এই প্রভুর গৃহপালিত পশু, মূল্যবান আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা অথবা অন্য পাঁচটা সম্পত্তিরই অন্যতম বলে বিবেচিত। নারীও আপনাকে ''পরের'' অধীনস্থ বলে বিবেচনা করেন এবং নিজের গৃহকে ''পরের'' বাড়ি বলে গণ্য করেন। অপর পক্ষে, স্বামীও গৃহকে একমাত্র তাঁরই বলে মনে করেন। সম্পদ, আনন্দ, সামাজিক ভূমিকা ইত্যাদি নিয়ে স্বামী নিজের জীবনকে অনেক বেশি পরিপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে পারেন। কিন্তু এসব বিবর্জিত বলে এবং মূল্যবান অলঙ্কার বা জড়পিণ্ডের মতো জীবনধারণ করতে হয় বলে স্ত্রী বেঁচে থেকেও মৃত। তাঁর ''ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট।'' আদর্শ চরিত্র বলে গৌরবারোপিত সীতার সমালোচনা করে তিনি বলেন, সীতা আদৌ আদর্শ অথবা অনুকরণীয় নন। যুক্তি এবং ঔচিত্যবর্জিত রামের তিনি ক্রীড়নক মাত্র। রোকেয়া মতে:

> ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীব কাহারা জানেন? সে ভারতনারী। এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্য জাতির দুঃখে বিচলিত হইয়াছেন; পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে; তাই যত্রতত্র ''পশু ক্লেশ নিবারণী সমিতি'' দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য এংলো ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দিনী

তাঁর মতে, উড়তে শেখার আগেই পিঞ্জরাবদ্ধ এই নারীদের ডানা কেটে দেওয়া হয়। এবং তারপর সামাজিক রীতিনীতির জালে আষ্ঠেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা হয় তাঁদের। এ শিক্ষা তাঁদের মনে দৃঢ়মূল যে, স্বামী মাথা কেটে ফেললেও "আহ" বলতে নেই। ইংরেজ নারীদের সঙ্গে এঁদের তুলনা করে তিনি বলেন, পুরুষ যখন গুরুতর অপরাধ বা বিশ্বাসঘাতকতা করেন, দেশীয় নারী তখন আপন দুর্বহ দুঃখে পৃষ্ট হন, প্রতারক পুরুষের পদপ্রান্তে লুটিয়ে দয়া ভিক্ষা করেন, তবু তাঁর প্রতি ভক্তি ফিরিয়ে নিয়ে ঘৃণা করতে পারেন না। স্বামীর ব্যভিচার অধঃপতন দেশীয় নারীর লজ্জা বা অসম্মানের কারণ বলে বিবেচিত হয় না, অথচ স্ত্রীর সামান্যতম পদস্খলনে স্বামী লজ্জিত হন এবং তাকে একটা সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে পরিণত করেন।

নারীর এই অসীম দাসত্ব এবং অপমানের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, নারী অকর্মণ্য। কর্মময় যে জীবন মানুষকে উপযোগিতা দান করে, নারী সেই ভূমিকাবর্জিত। হয়তো নারীর কৃপা লাভের জন্যে অতীত কালে পুরুষ তাঁকে সকল তাৎপর্যপূর্ণ ক্রিয়া থেকে মুক্তি দান করেন। ফলে নারী ক্রমশ অকর্মণ্য হয়ে পড়েন এবং তার ফলে এক সময়ে অনুগ্রহের পাত্র বলে বিবেচিত হন। দাসত্বের আর–একটি কারণ নারীর আত্মসম্মানের অভাব। দীর্ঘকালের কুশিক্ষাবশত নারী নিজেকে নিকৃষ্ট এবং পুরুষকে নিজের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন। এ শিক্ষা নারীর মজ্জাগত। তাই, যে–সম্পত্তি নারীর নিজস্ব এবং যার ওপর তার স্বামী পুরোপুরি নির্ভরশীল, নারী তাকেও স্বামীর বলেই গণ্য করেন এবং স্বামীকে নয় – নিজেকেই বিবেচনা করেন কৃপার পাত্র বলে। রোকেয়া মতে, নারীর দাসত্বের প্রধান কারণ, পুরুষশাসিত সমাজ ধর্মের নাম করে নারীর দাসত্বকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ এবং অলৌকিক মহিমা দিয়েছে।

জীবনকে অর্থবান করার জন্যে এই শোচনীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি আবশ্যিক, এ বিষয়ে রোকেয়ার ভাবনায় কোনো দ্বিধা বা অস্পষ্টতা ছিলো না। সমকালীন আলোকিত নারীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এই যে, তাঁরা নারীর দুর্দশা লাঘব করতে চেয়েছেন মাত্র। লেখাপড়া, গৃহকর্ম, সন্তানলালন–পদ্ধতি শিখে আরও ভালো মা এবং স্ত্রী হওয়ার প্রয়োজনকেই গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁরা। অর্থাৎ, ঐতিহ্যিক ভূমিকাকে অক্ষুণ্ন রেখে নারী হিশেবে পুরুষদের হাতে আরও বেশি শোষিত হওয়ার, আরও উপযোগী হওয়ার পরামর্শ তাঁদের। আত্মবিকাশ নয়, সমাজের নামে আত্মত্যাগের আদর্শে তাঁরা বিশ্বাসী। গৃহকর্ম, রন্ধন, সন্তানলালন, পরিজনের যত্ন ইত্যাদিকে রোকেয়াও নারীর কর্ম বলে আখ্যায়িত করেছেন, কিন্তু নারীর জীবন যে এতেই সীমাবদ্ধ নয়, এটা তিনি বিশেষ জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি লক্ষ্য করেছেন, পুরুষ লেখকরা নারীদের সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেন। একে তিনি পুরুষদের স্বার্থপরতা বলেই অভিহিত করেন। কারণ কেবল সহিষ্ণুতার প্রশংসা আসলে পুরুষ সমাজের শোষণ এবং দুর্ব্যবহারেরই সমর্থন। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে যিনি স্বামী এবং সংসারের সেবায় আত্মত্যাগ করেন, সমাজের চোখে সেই নারীই আদর্শ।

রোকেয়ার চোখে নারীমুক্তির অর্থ পুরুষের সমকক্ষতা।

> জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব।

এই সংজ্ঞায় রোকেয়া যে পুরুষের কথা বলেছেন, সে পুরুষ অথবা সব পুরুষই আদর্শ স্থানীয় কিনা, তিনি সে সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন না। সে জন্যে পাদটীকায় আপন বক্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন:

> আমাদের উন্নতির ভাব বুঝাইবার জন্য পুরুষের সমকক্ষতা বলিতেছি। নচেৎ কিসের সহিত এ উন্নতির তুলনা করিব? পুরুষদের অবস্থাই আমাদের উন্নতির আদর্শ। একটা পরিবারের পুত্র ও কন্যায় যে প্রকার সমকক্ষতা থাকা উচিত, আমরা তাহাই চাই। যেহেতু পুরুষ সমাজের পুত্র, আমরা সমাজের কন্যা।

২৩/২৪ বছর বয়সে, ১৯০৪ সালে রোকেয়া যখন পুরুষের সমকক্ষতা অর্জনের দাবি জানান, তখন বাঙালি সমাজে এ ধারণা অভিনব ছিলো। আধুনিকা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কবি কামিনী সেন, নারীর অধিকার সচেতন কৃষ্ণভাবিনী দাস অথবা সরলা দেবী প্রমুখ যাঁরা তখন পর্যন্ত নারীজাগরণের কথা বলেছেন, তাঁরা লেখাপড়া শিখে ঐতিহ্যিক ভূমিকা আরও নিপুণভাবে পালন করার কথায়ই জোর দিয়েছেন। সমকক্ষতা লাভের দাবি তাঁরা তোলেননি। বস্তুত, নারীর মুখে এ দাবি অসঙ্গত এবং অবাস্তব বলেই গণ্য হতো। রোকেয়া সেটাই করেছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথসহ সেকালের কোনো নাম করা লেখক যে তাঁর কথা কোথাও উল্লেখ করেননি, সে কি কেবল তাঁর লেখা বহুলপ্রচলিত পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি বলে, নাকি তাঁর বক্তব্যকে তাঁরা তখন নিতান্ত আজগুবি বলে আলোচনার অযোগ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন, বলা মুশকিল।

পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্যে স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজন হলে, রোকেয়ার মতে, তাই করতে হবে। কেরানি থেকে আরম্ভ করে মহিলারা জজ, ব্যারিস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট – সব কর্মেরই উপযুক্ত। একদিন তাঁরা হয়তো ভাইসরয়ও হবেন। যে শ্রম মহিলারা স্বামীর সংসারে নিয়োজিত করেন, সেই শ্রম দ্বারা স্বাধীন ব্যবসা করাও আদৌ অসম্ভব নয়। এমন কি, কৃষিক্ষেত্রেও তাঁরা কাজ করবেন না কেন? মোট কথা, তাঁরা যেন অন্নবস্ত্রের জন্যে কারো

১৮৮০–এর দশক থেকেই চন্দ্রমুখী বসু, কামিনী সেন, কাদম্বিনী গাঙ্গুলি, বিধুমুখী বসু, মোহিনী খাস্তগির, কুমুদিনী খাস্তগির, সরলা দেবী প্রমুখ ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টান মহিলারা চাকরি করতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও, বর্তমান শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশক পর্যন্ত মহিলাদের চাকরি করার দৃষ্টান্ত সমাজে আদর্শ অথবা বাঞ্ছনীয় বলে গৃহীত হয়নি। ১৯০১ সালে বঙ্গদেশে ইংরেজ এবং অ্যাংলো–ইন্ডিয়ান মহিলাসহ মাত্র ১১৫৬ জন মহিলা শিক্ষক, ৬৭ জন কেরানি, ৮৪৯ জন নার্স এবং ১৫১ জন চিকিৎসক হিশেবে কাজ করছিলেন (তুলনায় অনেক বেশি নারী – ৪৫,৪৯১ জন – নিয়োজিত ছিলেন বেশ্যাবৃত্তিতে)। রোকেয়ার কথা মতো জজ, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ব্যারিস্টার ছিলেন না একজনও। সুতরাং তাঁর উক্তি সে পর্যায়ে ছিলো উচ্চাশা এবং দুঃসাহসের, এমন কি, উপহাসের।

সমকক্ষতা লাভের দ্বিতীয় শর্ত, রোকেয়ার বিবেচনায়, আত্মার বিকাশ। এবং আত্মার বিকাশ নির্ভর করে শিক্ষার ওপর। তাঁর মতে, "শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন।" এই শিক্ষার যথার্থ বিকিরণেই নারীহৃদয় বিকশিত এবং পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে।

বোঝা না হয়ে সংসারে রমণী যাতে পুরুষের সহচরী, সহকর্মী এবং সমধর্মিণী হবেন – এটাই রোকেয়ার প্রত্যাশা। তাঁর মতে, নারী পুরুষের যটর্রভণর, ঠর্ণর দটফত। এবং পুরুষ নারীর স্বামী নয়, অর্ধাঙ্গ, জীবনসঙ্গী। বঙ্গসমাজে নারী–অংশ পুরুষ–অংশের চেয়ে নিকৃষ্ট। এর ফল অনাসৃষ্টি। একটি চাকা বড়ো, একটি ছোটো হলে গাড়ি যেমন সামনে যেতে ব্যর্থ হয়, নারী ও পুরুষের অসমান অবস্থাও তেমনি বঙ্গসমাজের উন্নতির প্রধান বাধা। তা ছাড়া, বঙ্গসমাজে স্বামী এবং স্ত্রীর অন্তরঙ্গতা আপতিক, অগভীর। তারও কারণ নারী ও পুরুষের বিষম উন্নতি।

> স্বামী যখন পৃথিবী হইতে সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একটা বালিশের ওয়াড়ের দৈর্ঘ্যপ্রস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা–সাহায্যে সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালাবেষ্টিত সৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্যমণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধূমকেতুর গতি নির্ণয় করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন এবং রাধুনীর গতি নির্ণয় করেন।

রোকেয়ার বিবেচনায় এটাকে মোটেই সুখী অথবা আদর্শ জীবনের চিত্র বলে ধরে নেওয়া যায় না। জীবনকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে এবং সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্যে নারীকে পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করতে হবে। নারী ও পুরুষের স্বার্থ পরস্পরবিরোধী নয়, সম্পূরক; কারণ পুরুষের উন্নতিও নির্ভরশীল নারীর উন্নতির ওপর।

কল্যাণ ও প্রগতি বাঞ্ছনীয় হলেও, মানুষ অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় তাকে অস্বীকার করে। ঔচিত্য এবং প্রচলিত আচার অনেক সময়েই মিতালি করে না। নারীমুক্তি তাই অভীষ্ট হলেও, ঐতিহ্যিক সমাজের শাশ্বত মূল্যবোধ তার সহায়ক নয়। "জাগিয়া উঠা সহজ নহে, সমাজ মহাগোলযোগ বাধাইবে, ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য "কৎল"–এর (অর্থাৎ প্রাণদণ্ডের বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানলের ব্যবস্থা দিবেন", এমন কি, "ভগ্নীদিগেরও জাগিবার ইচ্ছা নাই...।" কিন্তু সমাজের সার্বিক মঙ্গলের জন্যে নারীজাগরণ আবশ্যিক এবং একবার জাড্য ঘুচিয়ে আন্দোলন শুরু করতে পারলে, রোকেয়া মনে করেন, ক্রমশ সমাজের অনুমোদনেরও অভাব হবে না। অন্তত পশ্চিম ভারতের পার্সি সমাজে তিনি সেটাই লক্ষ্য করেছেন।

পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে যে মীথ সমাজের পরতে পরতে বিদ্যমান, তা তাঁর মতে মূল্যহীন, শ্রদ্ধার অযোগ্য। যে ধর্ম পুরুষরচিত এবং যার কারণ তাঁদের স্বার্থ রক্ষা, তা–ও এমনি মূল্যহীন এবং শ্রদ্ধার অযোগ্য। পুরুষসমাজ ধর্মের নামে, প্রকৃত পক্ষে, স্মরাণাতীত কাল থেকে প্রতারণা করে এসেছেন নারীদের। সে জন্যেই নারীহন্তা পুরুষদের জন্যে কোনো দণ্ডের বিধান নেই। নিজের জানা কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়ে রোকেয়া দেখিয়েছেন, পুরুষ কিভাবে নারীদের প্রতারণা এবং পরোক্ষত হত্যা করে; অথচ সংসারে তার কোনো প্রতিবিধান হয় না। জীবিকা উপার্জন করেন বলে পুরুষদের যে অহঙ্কার, রোকেয়ার মতে, সেও পূর্ববর্তী পদ্ধতির অন্তর্গত। তাঁর মতে, নারীর ন্যায্য অধিকার ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে বলে মুসলমানরা যে দাবি করেন, তা অবাস্তব। কারণ, তত্ত্বত ইসলাম মেয়েদের শারীরিক হত্যা নিবারণ করলেও, মুসলমানরা অম্লান বদনে কন্যাদের মনন, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধিবৃত্তি আজও অবাধে হত্যা করছেন। কন্যাকে জ্ঞানের আলোক থেকে বঞ্চিত করা এবং চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে বিবেককে পঙ্গু করা অনেক মুসলমান কেবল যে অন্যায় বলে মনে করেন না, তাই নয়, বরং তাকেই গণ্য করেন আভিজাত্যের পরিচায়ক বলে।

নারীদের শোষণ করার সুবিধাজনক অবস্থা থেকে পুরুষ সমাজ বিনা বাধায় সরে যাবেন, তা অপ্রত্যাশিত। বস্তুত, সুকঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়েই নারীমুক্তি আসা সম্ভব। এর জন্যে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন পুরুষের অন্যায় কর্তৃত্ব এবং দুঃশাসন অগ্রাহ্য করা। এই শক্তির প্রেরণা দিতে পারে আত্মশক্তির সম্যক উদ্বোধন। পুরুষের কাছে দয়া ভিক্ষা নয়, অধিকার আদায়; বঞ্চনার ক্রন্দন নয়, প্রতিবাদ – রোকেয়ার এই আদর্শই তাঁকে তাঁর সমকালীন নারীদের থেকে স্বতন্ত্র করেছে। সমাজশোষিত নারীর করুণ অবস্থা দর্শনে বিচলিত মানকুমারী বসু সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিলেন,"কাঁদ তোরা অভাগিনী। আমিও কাঁদিব,/ আর কিছু নাহি পারি ক ফোঁটা নয়নবারি / ভগিনী! তোদের তরে বিজনে ঢালিব।" এ

আমি কিন্তু তাঁহার সহিত একমত হইয়া কাঁদিবার সুরে সুর মিলাইতে পারিতেছি না। আমার ভগ্নীটি অবশেষে সবখানি শক্তি কাঁদিয়া মরিতে ব্যয় করিলেন। ব্যস! ঐরূপ বিজনে অশ্রু ঢালিয়াইত আমরা এমন অবলা হইয়া পড়িয়াছি।

তাঁর সমাধান ভিন্ন, আহ্বানও ভিন্ন।

বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী! আমরা আসবাব নই; বল কন্যে! জড়াউ অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্ধুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ।"

আত্মসম্মানের শোচনীয় অভাব যে বঙ্গদেশীয় নারীর প্রধান সীমাবদ্ধতা, কদণ্ুলরঢণর মত ঊণফধডধট কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গেও রোকেয়া তা উল্লেখ করেন। অথবা বলা যেতে পারে, এবং তাই বোধ হয় বলা উচিত, বঙ্গদেশের নারীদের আত্মসম্মানের অভাব প্রকটনের জন্যেই রোকেয়া ডেলিসিয়া চরিত্রের সঙ্গে বাংলাভাষাভাষী নারীদের পরিচয় করিয়ে দেন। ডেলিসিয়ার সঙ্গে দেশীয় নারীর তুলনা করে তিনি বলেন, ডেলিসিয়ার জীবনসমর–প্রাঙ্গণে অমিততেজ বীরের ন্যায়। স্বামীর বিশ্বসঘাতকতায় তিনি স্বামীকে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু দেশীয় রমণী এ ক্ষেত্রে বরং অত্যাচারীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে নাকি কান্না ধরেন, 'প্রভো! দাসীর কি অপরাধ হইয়াছে অথবা দাসীর প্রতি সদয় হও।' শেষে অশ্রুধারায় শ্রীচরণ ধুইতে বসিয়া পুনঃপুনঃ পদাঘাত লাভ করিবেন।' – ডেলিসিয়া আর বঙ্গনারীতে এই প্রভেদ।

তাঁর মতে, এদেশে নারী যতোদিন আত্মীয়স্বজনের অত্যাচার সহ্য করে তাঁদের পদলেহন করতে প্রস্তুত, ততোদিন তাঁর প্রশংসা; কিন্তু আপন অধিকার সচেতন হলেই নিন্দা এবং কলঙ্ক। এর কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার অভাব।" দেশীয় নারী ভূমিষ্ঠ হয়েই শুনতে পান, নারী দাসী এবং চিরকাল দাসীই থাকবেন। সুতরাং তাঁর মন পর্যন্ত দাসীতে পরিণত হয়। নারীর সুপ্ত মানসিক শক্তিকে শিক্ষাই কেবল জাগরূক করতে পারে। শিক্ষার আলোক অন্ধ নারীকে দেবে যথার্থ দৃষ্টিশক্তি। আর সে দৃষ্টি দিয়েই নারী বুঝে নেবেন মানুষ হিশেবে তাঁর মৌলিক অধিকার। এমন কি, ঐতিহ্যিক যেসব ভূমিকা নারীর পক্ষে আবশ্যিক – আদর্শ কন্যা, আদর্শ ভগ্নী, আদর্শ স্ত্রী এবং আদর্শ মাতা – সেসবের জন্যেও শিক্ষাই তাঁকে তাদের জন্যে উপযুক্ত করে তুলবে।

শিক্ষাই যেহেতু নারীমুক্তির প্রথম শর্ত, রোকেয়ার বিশ্বাস, সে কারণেই পুরুষ সমাজ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি এতো বিরূপ। পুরুষের ধারণা, শিক্ষা নারীকে তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তুললে চিরকালীন শোষণে ছেদ পড়বে। সে জন্যেই অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ নির্বিকার চিত্তে ক্ষমা করলেও, শিক্ষিত মহিলার সামান্যতম দোষকে শতগুণে বাড়িয়ে স্ত্রীশিক্ষার নিন্দা করে। উন্নতির প্রত্যাশায় সমাজ নানা সভাসমিতি স্থাপন করে, আন্দোলন করে, অথচ স্ত্রী–কন্যাদের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখে। তাঁর কথায়, এর তুলনা গাছের গোড়া কেটে আগায় সুশীতল বারিসেচনের। তাঁর মতে, মুসলমান সমাজ এর আশ্চর্য নিদর্শন। বিদ্যালয়ের অভাব নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়; কিন্তু রোকেয়া মনে করেন, ইচ্ছে থাকলে নিজের আন্তরিক চেষ্টাতেই নারী শিক্ষিত হতে পারেন। সেই আন্তরিক প্রযত্নই বড়ো কথা; কারণ সেই প্রযত্ন যেখানে অনুপস্থিত, এমন কি, ঈশ্বরও সে ক্ষেত্রে সাহায্যে পরাঙমুখ।

যেশিক্ষার কথা রোকেয়া বলেছেন, তার মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা অথবা সেকালের নারীসুলভ সীমাবদ্ধতা ছিলো না। সব বিদ্যাই মেয়েদের উপযুক্ত কিনা, তাঁর সমকালে এ নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিলো। অনেকেরই ধারণা ছিলো, মেয়েদের সব কিছু শেখার দরকার নেই এবং সবকিছু তাঁদের জন্যে ভালোও নয়। কিন্তু রোকেয়া মনে করতেন, সব বিদ্যাতেই মহিলাদের সমান অধিকার – এমন কি, বিজ্ঞানেও। সংগীত এবং চিত্রবিদ্যার প্রতি মুসলমান সমাজের বিরূপতা সুবিদিত। কিন্তু এ দুটিও তাঁর শিক্ষাক্রম থেকে বাদ যায়নি। কবিতা রচনা সম্ভবত শিক্ষা সাপেক্ষ নয়। কিন্তু রোকেয়া তাকেও নারীশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে, নারীকে সর্ববিদ্যায় পারদর্শী করে সুমার্জিত এবং পূর্ণবিকশিত একটি ব্যক্তিতে রূপায়িত করাই ছিলো তাঁর বাসনা।

পাঁচ

যদিও ভাবুক এবং কর্মী হিশেবেই তাঁর প্রধান পরিচিতি, রোকেয়া নারীও। অন্তরের অন্তস্তলে সেই নারী প্রেমে ভালোবাসায় পারিবারিক জীবনের আদর্শে কতোটা আধুনিক, তাঁর প্রবন্ধগুলো সে দিকে বড়ো একটা ইঙ্গিত দেয় না। সৌভাগ্যক্রমে তিনি একখানা উপন্যাসও রচনা করে গেছেন। সে উপন্যাস বাংলা সাহিত্যকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু তার লেখিকার অন্তরকে বোধ হয় অনেকাংশে অনাবৃত করেছে। এ উপন্যাসের অংশবিশেষ যে আত্মজৈবনিক, তা প্রায় সন্দেহাতীত। পদ্মরাগ উপন্যাসের (১৯২৪–২৫, রচনাকাল ১৯০২–০৩) প্রধান দুটি চরিত্র দীনতারিণী এবং সিদ্দিকা ওরফে পদ্মরাগ। দীনতারিণী এবং পদ্মরাগ – উভয় নামই তাদের চরিত্রের ইঙ্গিত

দীনতারিণী বিধবা হন তরুণ বয়সে, লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার স্বামী অকালে দেহত্যাগ করায়। স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দীনতারিণী। সন্তানহীন। স্বামীর মৃত্যুর পরে তিনি একটি বিধবা আশ্রম এবং বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, আত্মীয়স্বজনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও। রোকেয়ার স্বামী ব্যারিস্টর নন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এবং রোকেয়া বিধবা আশ্রম নয়, কেবল মাত্র বালিকা বিদ্যালয় খুলেছিলেন – দীনতারিণীর সঙ্গে রোকেয়ার পার্থক্য আপাতদৃষ্টিতে এইটুকু।

দীনতারিণী ব্রাহ্ম, কিন্তু তাঁর আশ্রম এবং বিদ্যালয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান – সকলেরই এক ইউটোপিয়ান মিলনাস্থান। আশ্রম ও বিদ্যালয়ের কর্মীরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বা খৃষ্টান; এবং প্রায় অবাস্তব এক সদ্ভাব তাঁদের মধ্যে বর্তমান। বাস্তবে রোকেয়া যে সেক্যুলার পরিবেশ তৈরি করতে পারেননি তাঁর সাখাওয়াত মেমেরিয়ালে, তারিণীভবন তা–ই। এবং এর মধ্য দিয়ে তাঁর মনের প্রশস্ত অসাম্প্রদায়িক আদর্শই প্রতিফলিত হয়। তারিণীভবনের ছাত্রীদের দু পাতা পড়তে শিখিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে ঢেলে বিলাসিতার পুত্তলিকা গঠন করা হয় না। বিজ্ঞান, সাহিত্য, খগোল, গণিত সবই শেখানো হয় তাদের। বিকৃত ইতিহাস শিখিয়ে স্বদেশবাসীকে ঘৃণা করার মনোভাব তাদের গঠন করা হয় না। উচ্চ আদর্শের সুকন্যা, সুগৃহিণী, সুমাতা হওয়ার এবং দেশ ও ধর্মকে ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের। বিশেষ করে জোর দেওয়া হয় আত্মনির্ভরতা ও স্বাবলম্বনের ওপর। ছাত্রী এবং কর্মীরা সূচিকর্ম করেন, চরকা কাটেন, তাঁতে কাপড় বোনেন, বই বাঁধান এবং মিষ্টি তৈরি করেন। কেউ বা শিক্ষিকা হওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করেন। টাইপিং এবং নার্সিংও শেখেন কেউ কেউ।

তারিণীভবনের প্রধান কর্মী চারুবালা, সৌদামিনী, হেলেন, জাফরি, রাফিয়া, সাকিনা, রসিকা, ঊষা প্রমুখ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী এবং বিভিন্ন পরিবেশ থেকে আগত। কিন্তু এক জায়গাতে তাঁদের মিল আছে – তারা সবাই স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা বা নির্দয়তার শিকার। উপন্যাসের নায়িকা পদ্মরাগ ওরফে সিদ্দিকাও বিবাহের করুণ শিকার। স্বার্থপর পুরুষ সমাজ যে নির্মমভাবে নারীনির্যাতন করে, এই মহিলাদের সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনীতে তা বিবৃত।

পদ্মরাগ ওরফে সিদ্দিকা নানা গুণে গুণান্বিত– রোকেয়ার অকৃপণ সহমর্মিতা প্রকাশিত তার মধ্যে, রোকেয়ার স্বপ্নই হয়তো। অপরূপ সুন্দরী সে। সুশিক্ষিত। ইংরেজ মহিলাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ইংরেজি কবিতার জন্যে সে তিন তিনবার পুরস্কার পেয়েছে। সেকালের শিক্ষিত এবং অভিজাত মুসলমান মহিলাদের মধ্যে যা একেবারে বিরল – সিদ্দিকা সংগীতজ্ঞ। টাইপিংও জানে সে (আদৌ কোনো বাঙালি মহিলা সেকালে টাইপিং জানতো কিনা, সে বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে।) কিন্তু এহ বাহ্য। তার আসল ঐশ্বর্য ভেতরে – সে স্বাবলম্বী, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং স্বামী, সংসার, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কিত ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাহীন, এমন কি, দ্রোহী। বিভিন্ন রচনায়, বিশেষত কদণ ুলরঢণর মত ঊণফধডধট কাহিনী পরিবেশনের সময়ে রোকেয়া দেশীয় নারীর যেসব অভাবের বর্ণনা করে ধিকার দিয়েছেন, ক্ষতিপূরণস্বরূপ সিদ্দিকাকে যেন তার সবকিছু দিয়ে রচনা করেছেন।

সুশিক্ষিত, সুদর্শন ব্যারিস্টার লতীফ আলমাসকে গভীরভাবে ভালোবাসলেও এবং কৈশোরে তার সঙ্গে ধর্মীয় রীতিতে বিবাহিত হয়েছিলো, তা আবিষ্কার করার পরেও, লতীফের সঙ্গে ঘর করতে রাজি হয়নি সিদ্দিকা। কারণ, মাঝখানে অভিভাবকের চাপে লতীফ আর একটি বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিলো। সে স্ত্রী অবশ্য মৃত। কিন্তু দোজবরের সঙ্গে ঘর করার কথা সে ভাবতে পারে না। সমাজ সংস্কারক রোকেয়া যদি দীনতারিণীতে প্রতিফলিত হয়ে থাকেন, প্রেমিকা নারী রোকেয়া তা হলে সিদ্দিকায়। বিপত্নীক সাখাওয়াতের দ্বিতীয় স্ত্রী হতে কিশোরী রোকেয়ার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছিলো কিনা, তা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁর নায়িকা সিদ্দিকার মর্যাদা বোধ এ ব্যাপারে টনটনে। সম্ভবত বাস্তব জীবনে সমাজ এবং সংসারের চাপে রোকেয়া যা প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি, তা করেছে তাঁর নায়িকা।

সিদ্দিকা বলে

> আমরা কি মাটির পুতুল যে, পুরুষ যখন ইচ্ছ প্রত্যাখ্যান করিবেন, আবার যখন ইচ্ছা গ্রহণ করিবেন? .. আমি যদি উপেক্ষা লাঞ্ছনার কথা ভুলিয়া গিয়া সংসারের নিকটে ধরা দিই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই আদর্শ দেখাইয়া দিদিমা ঠাকুমাগণ উদীয়মানা তেজস্বিনী রমণীদের বলিবেন, "আর রাখ তোমার পণ ও তেজ – ঐ দেখ না এতখানি বিড়ম্বনার পরে জয়নব (সিদ্দিকা) আবার স্বামীসেবাই জীবনের সার করিয়াছিল।" আর পুরুষ সমাজ সগর্বে বলিবেন, "নারী যতই উচ্চশিক্ষিতা, উন্নতমনা, তেজস্বিনী, মহীয়সী, গরীয়সী হউক না কেন, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার আমাদের পদতলেই পড়িবেই পড়িবে।" আমি সমাজকে দেখাইতে চাই, একমাত্র বিবাহিত জীবনই নারীজন্মের চরম লক্ষ্য নহে; সংসারধর্মই জীবনের সারমর্ম নহে।

বিবাহ এবং লতীফ – উভয়ের প্রতিই সিদ্দিকার আন্তরিক আকর্ষণ সত্ত্বেও, যেন দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সে তাদের প্রত্যাখ্যান করে। প্রেম এবং আত্মমর্যাদার মধ্যে জয়ী হয় শেষ পর্যন্ত আত্মমর্যাদাই। অতঃপর সারা জীবন নারীজাগরণের জন্যে কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে সিদ্দিকা।

পদ্মরাগ উপন্যাস হিশেবে কাঁচা হাতের লেখা। শাস্ত্রীয় বিধান অনুযায়ী নায়ক–নায়িকার বিয়ে হয় বেশ কয়েক বছর আগে। কিন্তু তাদের কোনো দিন দেখা হয়নি এবং ইতিমধ্যে বর এবং কন্যাপক্ষের মধ্যে বিষয়সম্পত্তির কলহ নিয়ে

সেবা করতে গিয়ে নায়িকা তাকে ভালোবেসে ফেলে। ক্রমে এ–ও আবিষ্কার করে যে, আসলে এরই সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিলো। কিন্তু এ সত্য অজ্ঞাত থেকে যায় নায়কের কাছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ইন্দিরার সঙ্গে এখানটায় প্লটের মিল দুর্লক্ষ্য নয়। রোকেয়ার ভাষাও খানিকটা বঙ্কিমী। প্রবন্ধ আর উপন্যাসের মধ্যে ভাষার যে পার্থক্য থাকে, রোকেয়া অবশ্য তা বজায় রাখতে পারেননি। আর শুধু ভাষার দিক দিয়েই নয়, পদ্মরাগের ভাব থেকেও বোঝা যায়, পদ্মরাগ রোকেয়ার প্রবন্ধেরই প্রক্ষেপ। সমাজ সংস্কার, বিশেষ করে নারীজাগরণের উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন, উপন্যাসের উদ্দেশ্যও তাই। উপন্যাসের কোনো কোনো স্থানে পাদটীকায় নিজের প্রবন্ধেরও উল্লেখ করেছেন তিনি। স্ত্রীর নিকটে স্বামীর বিশ্বসঘাতকতা, যৌনবিষয়ে স্বার্থপর পুরুষসমাজের দ্বৈতমান এবং নারীর ক্রমবর্ধমান আত্মমর্যাদা এ উপন্যাসের থীম। শেষ পর্যন্ত সিদ্দিকার মাধ্যমে নারীর আত্মমর্যাদাই জয়ী হয়েছে। এ উপন্যাসের এটাই উল্লেখযোগ্য দিক। সমকালে রচিত অন্য কোনো বাংলা উপন্যাসে নারীর এ ধরনের বিদ্রোহ জয়ী হয়নি। প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ–এ কুমুর আত্মমর্যাদা কম ছিলো না; শিক্ষা, বৈদগ্ধ্য অথবা গুণও নয়। কিন্তু পরিণতিতে সে ঐতিহ্যিক সমাজের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। পদ্মরাগের যদি কোনো অভিনবত্ব অথবা অবদান থাকে তো তা এইখানে।

ছয়

রোকেয়ার রচনাবলীর অন্যতম বিষয়বস্তু স্বরূপের অন্বেষা। তাঁর প্রথম এবং সর্বশেষ রচনা প্রকাশিত হয় আটাশ বছরের ব্যবধানে। বঙ্গদেশের পটভূমিকায় ১৯০৪ থেকে ১৯৩২ সাল সংক্ষুব্ধ নিঃসন্দেহে। রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, যুদ্ধ এবং দুর্ভিক্ষ এ সময়ে বহু সংবর্তের সৃষ্টি করে। তদুপরি ব্যক্তিগত জীবনে স্বামীর মৃত্যু, উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চনা এবং রচনা প্রকাশ ও বিদ্যালয় পরিচালনায় প্রবল বিরোধিতা এবং সমালোচনার সম্মুখীন হন তিনি। কোন ঘটনা তাঁকে কতোটা প্রভাবিত করেছিলো, তা বলা কঠিন; কিন্তু স্বরূপের প্রশ্নে আলোচ্য কালে তাঁর মনোভাবের বিবর্তন সুস্পষ্ট। ১৯০৪ সালে একটি মুসলিম পরিচালিত পত্রিকায় তিনি লেখেন, ধর্ম অলৌকিক নয় – পুরুষ মানুষের তৈরি।

> পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভা বলে দশ জনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে ঈশ্বরের প্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ... যদি ঈশ্বর কোন দূত রমণী শাসনের জন্য প্রেরণ করিতেন, তবে সে দূত বোধ হয় কেবল এসিয়ায় সীমাবদ্ধ থাকিতেন না। দূতগণ ইউরোপে যান নাই কেন? আমেরিকা এবং সুমেরু হইতে কুমেরু পর্যন্ত যাইয়া "রমণীজাতিকে নরের অধীনে থাকিতে হইবে" ঈশ্বরের এই আদেশ শুনান নাই কেন? ...আরও দেখ, যেখানে ধর্মের বন্ধন অতিশয় দৃঢ় সেই খানে নারীর প্রতি অত্যাচার অধিক। যেখানে ধর্মবন্ধন শিথিল, যেখানে রমণী প্রায় পুরুষের ন্যায় উন্নত অবস্থায় আছেন। ধর্মের দোহাই দিয়া পুরুষ এখন রমণীর উপর প্রভুত্ব করিতেছেন।

এই অনুচ্ছেদে রোকেয়া কোনো বিশেষ ধর্মের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু এশিয়ার উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, এশিয়ায় প্রচারিত তিন বিখ্যাত ধর্মের – ইহুদী, খৃস্টান এবং ইসলামের কথা তাঁর মনে ছিলো। বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তবে তিনি নিজেকে প্রেরিত পুরুষ বলে দাবি করেননি। অপর পক্ষে, হিন্দু ধর্ম বিশেষ কোনো পয়গম্বর এসে প্রচার করেননি। সুতরাং সেটা তাঁর মনে ছিলো কিনা, বলা শক্ত। তবে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রধান ধর্মের কথা তিনি উল্লেখ করবেন না, বিশেষ করে যে ধর্মে নারীদের প্রতি পুরুষের সমাজের শোষণের সুযোগ মনু সংহিতার সুবাদে অনেক বেশি – এটা মনে করা কঠিন। এখানে একটা বিষয় লক্ষযোগ্য: ধর্মের অলৌকিকত্ব আক্রমণ করতে গিয়ে তিনি ঈশ্বর এবং দূত–এর মতো এমন সব শব্দ নির্বাচন করেছেন, যা থেকে ধর্মটিকে শনাক্ত করা না যায়।

ইসলামকে যে বাদ দেননি, এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যায়। তাঁর রচনার সমালোচনা যে হয়েছিলো, তার দুটি প্রমাণ পাওয়া যায়। সমালোচনার মুখে, এবং আমার ধারণা স্বসম্প্রদায়ের সমালোচনার মুখে, পরের মাসে একই পত্রিকায় অপেক্ষাকৃত নরম সুরে এবং ব্যাখ্যার ভঙ্গিতে তিনি লেখেন, মানসিক উন্নতির জন্যে আনুষ্ঠানিক ধর্ম ত্যাগ করার দরকার নেই। ঔদার্যই আসল কথা। আপন আপন সম্প্রদায়ের পার্থক্য রক্ষা করেও মনটাকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়। ঝাঁজ কম হলেও, এ বক্তব্যেও জোরের অভাব নেই, অস্পষ্টতাও নেই। তবে প্রথম রচনায় প্রায় নাস্তিক্যের যে স্বর শোনা যায়, তা এখানে অনুপস্থিত।

সমালোচনার দ্বিতীয় প্রমাণ, এক বছর পরে তিনি যখন মতিচুর গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের অবনতি নামে এ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তখন এই প্রবন্ধের ধর্মের অলৌকিকত্ব সম্পর্কিত বিতর্কিত এবং সবচেয়ে বলিষ্ঠ অংশটি বর্জন করেন অথবা বর্জন করতে বাধ্য হন। সম্প্রদায় অথবা সাম্প্রদায়িক / প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে তিনি অস্বীকার করেননি, কিন্তু ধর্ম

বস্তুত, ধর্মের অলৌকিক মহিমা সম্পর্কে মোহমুক্ত, সুতরাং ধর্ম ও সম্প্রদায়, পুরুষ ও নারী ইত্যাদি সম্পর্কে ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ তাঁর কাছে তেমন মূল্যবান নয়। তবে একই সঙ্গে এও লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি আপোশও করতে বাধ্য হচ্ছেন। সে জন্যেই ধর্মকে কড়া ভাষায় সমালোনা করে, পরে আবার তা বদল করতে বাধ্য হচ্ছেন।

প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত অপর এক রচনায় সাম্প্রদায়িক পরিচয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্টতর – সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রাদেশিকতা উভয়কেই তিনি সেখানে নিন্দা করেছেন। দেশ এবং জাতীয়তার নামে চিহ্নিত হওয়াই তাঁর মতে বাঞ্ছনীয়।

> আমরা শুধু হিন্দু বা মুসলমান কিংবা পারসী বা খৃষ্টিয়ান অথবা বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মাড়ওয়ারী বা পাঞ্জাবী নহি – আমরা ভারতবাসী। আমরা সর্বপ্রথমে ভারতবাসী – তারপর মুসলমান, শিখ বা আর কিছু।

সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘোষণা অসাধারণ। সকল ধর্মীয় এবং প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে উঠে এই পরিচয়কেই একমাত্র পরিচয় করার আহ্বান সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং বিপিন পাল ছাড়া সমকালে আর কোনো বাঙালিই জানাননি। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথও না। তিনি বরং ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল ধর্মাবলম্বীকেই হিন্দু বলে দাবি করেছেন। অর্থাৎ তাঁর কাছে ভারতবর্ষ আর হিন্দুত্ব একই কথা। অবশ্য এখানে হিন্দু শব্দটিকে তিনি যে ধর্ম অর্থে নয়, জাতীয়তা অর্থে ব্যবহার করেছিলেন, সেটা মনে রাখা সঙ্গত।

রোকেয়ার পক্ষে ভারতীয় বলে চিন্তা করতে পারা আরও বেশি অসাধারণ এই জন্যে যে, তখনকার মুসলমানদের মধ্যে এ ভাবনা আদৌ দেখা দেয়নি। তখনকার বেশির ভাগ শিক্ষিত মুসলমানই নিজেদের ভারতবর্ষীয় বলে বিবেচনা করতেন না, তাঁরা নিজেদের মনে করতেন আরব–ইরান থেকে আসা প্রবাসী বলে। সে জন্যেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতাও তাঁদের কাছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলে মনে হয়নি। তাঁদের এই মানসিকতার স্বরূপ আরও বোঝা যায়, মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব থেকে। তাঁরা বাংলাকে তাঁদের মাতৃভাষা বলে জ্ঞান করতেন না, নিজেদের তাই বাঙালি বলেও ভাবতেন না। তাঁদের বিবেচনায়, তাঁদের মাতৃভাষা ছিলো ফারসি, নিদেন পক্ষে, উর্দু। বাংলা ভাষায় তাঁদের দুর্বলতায় তাঁরা লজ্জিত বোধ করতেন না। বরং সেটাকেই বিদেশী হিশেবে স্বাভাবিক বলে মনে করতেন। ১৯৩০–এর দশকের আগে পর্যন্ত এই মনোভাবে তেমন ব্যাপক পরিবর্তন আসেনি।

উপরে যে তিনটি প্রবন্ধের কথা বললাম, এগুলো যখন তিনি লেখেন, তখন তাঁর বয়স মাত্রও ২৩/২৪ বছর। তারুণ্যের স্বভাবদ্রোহিতাই কি তাঁর একমাত্র সম্বল, নাকি ভিন্নতর শিক্ষাবশত গভীরতর কোনো বিশ্বাসে উদ্বোধিত তিনি? নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। তবে আমার ধারণা, তারুণ্য এবং উদার শিক্ষা উভয়ই ক্রিয়াশীল ছিলো তাঁর মননে। কিন্তু ব্যক্তির সীমানা তাঁর ক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য নয়। আগেই লক্ষ্য করেছি, বই প্রকাশের সময়ে তাঁর আপোশ করতে হয়েছিলো। তারপর স্বামীর মৃত্যুর আগে চার বছর এবং স্বামীর মৃত্যর পরে ন বছর তিনি আর লেখেননি। সে কি এই আপোশ করতে হলো বলে? স্বামীর মৃত্যুর পরে শোক, আত্মীয়দের সঙ্গে বিরোধ এবং বিদ্যালয়ের কাজে লেখা ব্যাহত হওয়া সম্ভব ছিলো, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর আগের চার বছর? স্বামীর মৃত্যুজনিত আঘাত অথবা বয়সবৃদ্ধিজনিত মৃত্যুভীতি, সামাজিক অথবা /এবং ব্যক্তিগত কী কারণে জানিনে, ১৯১৮ সাল থেকে তিনি যখন আবার লিখতে আরম্ভ করেন, আগ্নেয়গিরির উত্তাপ তখন বিগত, অবশিষ্ট কেবল নারীজাগরণের আন্তরিক প্রয়াস।

রক্ষণশীল মনে হয় রোকেয়াকে, যখন তিনি বলেন, যতোদিন মেয়েদের জন্যে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হবে, ততো দিন পাস–করা বিদ্যা না হলেও চলবে। শিক্ষয়িত্রী এবং স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকলে পর্দা মেনেও উচ্চশিক্ষা সম্ভব – এই উক্তিতেও একই রক্ষণশীলতা প্রতিফলিত। বোরকা প্রবন্ধে ১৯০৪ সালের প্রারম্ভে তিনি এ মন্তব্য করেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় একটি মুসলিম পরিচালিত পত্রিকায়। সম্ভবত পর্দানশিন মুসলমান সমাজের মহিলাদের কথা মনে রেখেই তিনি এ মন্তব্য করে থাকবেন। এমনও হতে পারে পর্দা সম্পর্কে তাঁর পেছু টান তখনো বর্তমান। বস্তুত, এই প্রবন্ধে রোকেয়া বোরকা পরাকে যেভাবে সমর্থন করেছেন, তা তাঁর পরবর্তী মনোভাবের সঙ্গে অতুলনীয় নয়। কিঞ্চিদধিক কুড়ি বছর পরে অবরোধবাসিনী লিখে যিনি সুকঠোর পর্দা প্রথা এবং তার ব্যাপক অপকারিতার কথা সোচ্চার কণ্ঠে প্রচার করেন, এমন কি, সমকালেও পর্দাপ্রথার অমানবিকতা প্রতিপন্ন করেন, বোরকা তাঁর রচনা বলে মনে হয় না। তবে, ধারণা করি, তিনি বোরকা আর অবরোধে বিশেষ পার্থক্য করতেন। বোরকাকে তিনি ভদ্র অথবা শালীন পোশাকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বলেছেন, দেশভেদে সভ্যতাভেদে দেহকে কমবেশি আবৃত করে রাখার জন্যে বিভিন্ন সভ্যতায় বিভিন্ন ধরনের পোশাক প্রচলিত। কিন্তু নিজের দেহকে উপযুক্ত আবরণের দ্বারা ঢেকে রাখার রীতি সভ্যতার নিদর্শন। দেশের নিম্ন শ্রেণীর মহিলারা, বিনা বাধায় এবং বিনা পর্দায় যাঁরা সর্বত্র ঘুরে বেড়ান, তিনি তাঁদের সভ্য বলে গণ্য করেননি। অনুমান করি, যরধশটডহ এবং ব্যক্তিগত পর্দা সম্পর্কে তাঁর একটা রক্ষণশীলতা শেষ পর্যন্ত বজায় ছিলো। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন তিনি এবং সভাসমিতিতে নিয়মিত উপস্থিত হতেন। কিন্তু বোরকা বোধ হয় কোনো দিন তিনি ত্যাগ করেননি। বোরকা ছেড়ে দিলে তাঁর স্কুলে রক্ষণশীল মুসলমানরা তাঁদের কন্যাদের পাঠাবেন না, তাঁর মনে এ আশঙ্কা ছিলো, নিজেই তিনি এ কথা লিখেছেন।

যে পরিচয়কে একদিন তিনি সবচেয়ে বরণীয় বলে গণ্য করেছিলেন ধর্ম এবং প্রাদেশিকতার পরিবর্তে ভারতবর্ষীয়, পুনরুল্লেখের অভাবই তাকে প্রকট করে তোলে। ধারণা হতে পারে, তাঁর এ পরিচয়কেই তিনি শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতে পারেননি। পদ্মরাগ উপন্যাসে একটা অসামান্য ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেলেও, তাঁর মুসলমান পরিচয়ই শেষ জীবনে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তখন মুসলমান শব্দের সমার্থক। একদা যিনি ধর্মীয় উৎসবের দিনেও হিন্দু ভাইদের ভুলে থাকতে পারেননি, বলেছেন, সমুদয় বাঙ্গালি এক বঙ্গের সন্তান; তাঁর পক্ষে নিজেকে কেবলমাত্র মুসলমান বলে চিহ্নিত করার প্রয়াস সে জন্যেই বিস্ময়কর বলে মনে হয়। তবে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে যে মানসিক ঔদার্যের কথা এক কালে তিনি বলেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত তাঁর আয়ত্তে ছিলো।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চার দশকে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক দারুণ তিক্ত হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও, তিনি যে এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা দানা বাঁধতে থাকার পরিপ্রেক্ষিতে। উচ্চ অবস্থানে থাকা প্রতিবেশী হিন্দুদের তরফ থেকে সব সময়ে তিনি যে ব্যাপক সহায়তা অথবা স্বীকৃতি পেয়েছেন, তেমন কোনো প্রমাণ অন্তত আমার হাতে নেই। আমি তাঁকে নারীমুক্তি সম্পর্কিত একজন অসাধারণ লেখিকা বলেই বিবেচনা করি এবং সে দিক দিয়ে দেখলে সমকালে তাঁর কোনো তুলনা ছিলো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সেকালের কোনো হিন্দু সাহিত্যিক অথবা সমালোচক কোথাও তাঁর উল্লেখ পর্যন্ত করেছিলেন, এমন নজির আমার জানা নেই। সে যাই হোক, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব বজায় রাখলেও, স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি, সংস্কার – এসব তাঁর উদ্বেগের কারণ হয়। এমন কি, খৃষ্টানরা নানা কৌশলে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছেন – এ–ও তাঁর রচনার বিষয়ভুক্ত হয়েছে।

য়োরোপীয় আধুনিক চিন্তায় যিনি প্রভাবিত, তিনি এ কথাও বলেছেন, "প্রাথমিক শিক্ষা বলিতে যাহা কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়, সে সমস্ত ব্যবস্থাই কোরানে পাওয়া যায়।" এ তাঁর কয়েক দশক আগেকার – সবই বেদে আছে – এই হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সমানভাবে তুলনীয়। তাঁর এই বিবর্তনের কারণ কী? আমার জানা নেই।

কিন্তু ধর্ম প্রসঙ্গে এ বিবর্তন সত্ত্বেও, এক জায়গায় তিনি অসামান্য বোধ হয় – বোধ হয় শেষ পর্যন্ত আপনার সে পরিচয়কে তিনি পুরোপুরি ক্ষুণ্ন করতে পারেননি। কন্যা নন, স্ত্রী নন, মা নন, তিনি যে একজন ব্যক্তি, এ পরিচয় তাঁর মধ্যে অকম্পিত। দিনান্ত বেলায়ও ব্যক্তি হিশেবে বিকশিত হবার নারীর মৌল অধিকার সম্পর্কে তিনি সোচ্চার।

তবে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর মনে বোধ হয় আগাগোড়াই একটু দ্বিধা ছিলো। ঐতিহ্যিক ভূমিকা এবং লিঙ্গনিরপেক্ষ ব্যক্তির ভূমিকা – এর মধ্যে সাধারণ নারীর জন্যে কোনটা আদর্শ – এ বিষয়ে তিনি সম্ভবত নিঃসংশয় হতে পারেননি। তাই সুশিক্ষিত হয়ে ঐতিহ্যিক ভূমিকা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার কথা তিনি একদিকে যেমন বলেছেন, তেমনি অন্য দিকে বলেছেন, ঘরের কাজ, রান্নাবান্না, সন্তানলালন ইত্যাদি তাঁদের প্রধান কাজ নয়। এমন কি, তাঁদের জীবন পতিদেবতার মনোরঞ্জনের জন্যে উৎসর্গিত হবার বস্তুও নয় অথবা বহুমূল্য রত্নালঙ্কার পরিধান করে পুতুল সাজাতেও গৌরব নেই।

যথাসম্ভব ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং ঐতিহ্যিক ভূমিকার সঙ্গে আপোশ – এমন কোনো সংশ্লেষণ তিনি করতে পেরেছেলেন কিনা, তারও কোনো স্পষ্ট ছবি তাঁর রচনায় পরিস্ফুট নয়। অনুমান করি, ঐতিহ্যিক মূল্যবোধের মধ্যে আবাল্য লালিত বলে তার জাড্য কাটাতে পারেননি। তবে যে দ্রোহিতা তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিলো, তা তাঁকে সকল পেছুটান–নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের উন্মেষে উদ্‌বোধিত করেছে। বিবাহ সম্পর্কিত ইংল্যান্ডীয় আইন, বিবাহ বিচ্ছেদে নারীর অধিকার, নারীর ভোটাধিকার, সমান কাজের জন্যে স্ত্রীপুরুষের সমান পারিশ্রমিক ইত্যাদি প্রশ্নে তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা, ঐতিহ্যিক মূল্যবোধনিরপেক্ষ। অপর পক্ষে, গৃহিণী, মাতা, কন্যার চিরকালীন ভূমিকার উল্লেখ করে তাদের সঙ্গে আদর্শ বিশেষণ জুড়ে দিয়ে তিনি যেন আকস্মিক সন্ধিতে সম্মত। ঐতিহ্যিক মূল্যবোধ এবং মুক্তির মন্ত্র – এই দুয়ের টানাপোড়েন, বস্তুত, তাঁর শেষ দিকের রচনায় দুর্লক্ষ নয়। বহু আয়োজন, অনেক দ্রোহিতা শেষ পর্যন্ত যেন সমাজের প্রেক্ষিতে কিঞ্চিৎ প্রশমিত; এমন কি, ইসলামের নামে। অথচ একদিন ধর্মকে তিনি অলৌকিক বিশেষণ আরোপিত নারীশোষণের হাতিয়ার বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু ঐতিহ্যের কাছে এ পরাজয় হয়তো নয়, এ হয়তো ব্যক্তিরই সীমাবদ্ধতা।